*International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)*
*A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal*
*ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)*
*ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)*
*Volume-X, Issue-I, January 2024, Page No.01-12*
*Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711*
*Website: http://www.ijhsss.com*
**DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i1.2024.01-12**

# বৌদ্ধ দর্শনালোকে নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা: একটি পর্যালোচনা

**সুমনা চন্দ**

*সহকারী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, দুর্গাপুর সরকারি কলেজ, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

***Abstract:***

*India is a land of spirituality. In the Vedas, Puranas and Upanishads, the words of sages are the path of our moral life. But we have forgotten their debt. Looking at the way of life in India today, almost all of us will agree that our lack of moral values is the cause of today's consequences. In the newspaper or any media, we get daily news of the deterioration of the present society. But here we are referring to the deterioration of our honest lives, not the physical or financial deterioration. Being a good human being is more important than following the rules. Aristotle said that the goal of morality is to achieve 'eudaimonia', or a life of excellence. In Eastern philosophy, as in the West, it is said that character formation is necessary in order to lead an excellent life, and this character formation is the real subject of morality. Now the question is how do you become a good-natured person? In what ways can a better moral life be attained? In this connection, I shall discuss the approach followed by the Buddhist philosophy. Because I think the simple and straightforward philosophy that Gautama Buddha presented to mankind is very relevant in today's social environment.*

**Keyword: Goutam Buddha, Śīla, Brahmabihāra, Middle Path, Moral Value, Ahiṁṣā (Non-Violence).**

আমাদের আচরণের কোনগুলি ন্যায় বা অন্যায় তার পথ রচনা করে নীতিবিদ্যা। প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে নৈতিক আচরণ-সম্পর্কিত একাধিক পথের সন্ধান দিলেও সকলেই এই বিষয়ে একমত যে ব্যক্তির অন্তরাতমার বা চিত্তের পরিশুদ্ধি না ঘটলে নৈতিকতার লক্ষ্য ব্যাহত হয়। প্রাচীনকালে সামাজিক রীতিনীতির অনুশাসনে ন্যায়-অন্যায় আচরণ নিয়ন্ত্রিত হলেও ব্যক্তির চরিত্রশুদ্ধি না হলে নিয়মের অনুশাসন আকারসর্বস্ব রূপ লাভ করে। প্রাচ্য নীতিতত্ত্বে প্রায় সকল নীতিদর্শনেই কেবল বহিরঙ্গ নয়। মানসিক শুদ্ধতাও নৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়েছে। বিভিন্ন নীতিদর্শনে বিভিন্ন পথের মাধ্যমে এই মানসিক শুদ্ধতার কথা বলা হলেও বৌদ্ধদর্শনে নির্দেশিত পথ অনেক বেশি সাবলীল ও সহজবোধ। এই মহানপথই পরবর্তীকালে বিশ্বজনীনতার রূপ লাভ করে।

**তাত্ত্বিক আলোচনা বিরোধী বুদ্ধদেব:** আমাদের মনে হতে পারে, বুদ্ধদেব নৈতিক বিষয়ে শিক্ষার জন্য অপরাপর নীতিদর্শন সম্প্রদায় যথা জৈন, ন্যায়-বৈশেষিক ইত্যাদি সম্প্রদায়ের অনুরূপ কঠিন তত্ত্বালোচনার

মাধ্যমে জনগণকে শিক্ষা দিতেন। কিন্তু বৌদ্ধ দর্শনের বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করলে দেখা যায় যে, বুদ্ধদেব কঠিন তত্ত্বালোচনায় সর্বদা নিশ্চুপ থাকতেন। বিশেষত জ্ঞানতত্ত্ব, জগৎতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব কিংবা সনাতন আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ক গূঢ় তত্ত্বের প্রতি তিনি উদাসীন ছিলেন। প্রচলিত অর্থে দার্শনিক বলতে যা বোঝায় বুদ্ধদেব তা নন। তিনি বাস্তবজীবনের বিষয়গুলি আলোচনা করতে এবং বাস্তব সমস্যা সমাধানে আগ্রহী ছিলেন। এই দিক থেকে তাঁকে অবশ্য বাস্তববাদী দার্শনিক বলা যেতে পারে। তিনি ছিলেন মূলত ধর্ম ও নীতি সংস্কারক। বলা চলে – বুদ্ধদেব জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ নীতিনিষ্ঠ দার্শনিক – সর্বশ্রেষ্ঠ নীতিসম্মত ধর্মের প্রবর্তক। তবে নিছক ভালো-মন্দ বা উচিত-অনুচিতের মধ্যে পার্থক্য করা তাঁর নৈতিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য নয়। তাঁর লক্ষ্য ছিল আরো গভীর। তা হল দুঃখ তাপে জর্জরিত সংসারে আবদ্ধ মানুষের জন্য ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক দুঃখমুক্তির পথ নির্দেশ।

**বুদ্ধদেবের উপলব্ধি ও নৈতিক শিক্ষা:** ভগবান বুদ্ধ উপলব্ধি করেছিলেন, মানুষের অধিকাংশ চিন্তা, অভ্যাস এবং ক্রিয়াকলাপের মূলে রয়েছে তার মনে বাসা বেঁধে থাকা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য – এই ছয়টি রিপু। যার কারণে গড়ে ওঠে জাগতিক বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা, যার পরিণামে আসে দুঃখ। আর দুঃখের অবসান ঘটাতে হলে চিত্তকে কামনা বাসনা মুক্ত করে শুদ্ধ করা প্রয়োজন, সৎ চরিত্র গঠন করা প্রয়োজন। তবে এর অর্থ যাগযজ্ঞ, দৈবশক্তিতে বিশ্বাস বা কঠোর তপশ্চর্যার মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করা নয়। বুদ্ধদেবের মতে, প্রত্যেক মানুষই নিজের ভাগ্যবিধাতা। ভাগ্য নির্ধারনের জন্য সে কোন বাহ্যশক্তির ওপর নির্ভরশীল নয়। ব্যক্তির নিজের অবস্থা – তা ভালো হোক বা মন্দ – সবই তার কৃতকর্মের ফল, এমনকি ভবিষ্যতে তার কী হবে সেটিও সম্পূর্ণভাবে তার কার্যের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং বৌদ্ধ নীতিতত্ত্বের অন্যতম ভিত্তি যে কর্মবাদ সেখানেও আমরা সম্পূর্ণ এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পাই। সেখানে ব্যক্তি নিজেই তার বাক্য-চিন্তা-ক্রিয়া সব কিছুর জন্য দায়ী। বৌদ্ধমতে ক্রিয়া মানেই ঐচ্ছিক ক্রিয়া। ব্যক্তির ইচ্ছা অর্থাৎ পছন্দ-অপছন্দ অনুযায়ী ব্যক্তি যে কর্ম সম্পাদন করে তার ফল তাকে ভোগ করতেই হয়। কুশল কর্ম ব্যক্তিকে উন্নতির পথে চালিত করে, আবার অকুশল কর্ম তাকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। মানুষই তার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা ধীরে ধীরে অন্তরের অশুদ্ধি নাশ করে নিজের দুঃখমোচন করতে সক্ষম। এই উদ্দেশ্যেই বুদ্ধদেব সারনাথে ঋষিপত্তন মৃগদাবে পাঁচজন ভিক্ষুর কাছে তাঁর দেওয়া প্রথম ধম্মোপদেশেই দুঃখ, দুঃখ সমুদায়, নিবৃত্তি ও নিবৃত্তির উপায় সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন। এই চারটি বিষয় সম্পর্কে তাঁর যে মত, সেটিই বৌদ্ধ নৈতিকতার মূল ভিত্তি। রোগ, জরা, বার্দ্ধক্য, অপ্রিয় সংযোগ, প্রিয় বস্তুর অপ্রাপ্তি প্রভৃতি শারীরিক ও মানসিক দুঃখ আমাদের জীবনের অঙ্গ। তবে দুঃখ অকারণ নয়। দুঃখের কারণ মূলত একটাই – অবিদ্যা। বুদ্ধদেব উপলব্ধি করেছিলেন, কারণের (অবিদ্যা) বিনাশেই কার্য্যের (দুঃখ) বিনাশ সম্ভব।

**দুঃখ নিবৃত্তির উপায়রূপে অষ্টাঙ্গিকমার্গ:** বুদ্ধদেবের উপলব্ধিতে দুঃখ যেমন সত্য, তার মুক্তিও সম্ভব – একথাও সত্য - "ill and the ending of ill"।[১] তবে কেবলমাত্র আত্যন্তিক দুঃখমুক্তি তথা নির্বাণের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেই তিনি তাঁর কাজ সমাপ্ত করেননি। প্রচার করেছেন সেই দুঃখমুক্তির উপায় যা চতুর্থ আর্য্যসত্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামে পরিচিত। 'মার্গ' কথার অর্থ হল পথ। অষ্টাঙ্গিক মার্গের আটটি অঙ্গ হল –

১। সম্যক্-দৃষ্টি (সম্মা দিট্ঠি): সম্যক্ শব্দের অর্থ 'যথার্থ' এবং 'দৃষ্টি' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান'। সুতরাং সম্যক্ দৃষ্টি বলতে বোঝায়, জগৎ ও জীবনের স্বরূপ সম্পর্কে সত্যজ্ঞান লাভ করা।

২। সম্যক্-সংকল্প (সম্মা সংকপ্পো): হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদিকে পরিত্যাগ করার ইচ্ছাই হল সম্যক্ সংকল্প।

৩। সম্যক্-বাক্ (সম্মা বাচা): সম্যক্ বাক্ বলতে বোঝায় মিথ্যাকথা পরিহার করে সর্বদা সত্য কথা বলা।

৪। সম্যক্-কর্ম (সম্মা কম্ম): কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য দ্বারা পরিচালিত না হয়ে অহিংসা, মৈত্রী, করুণা দ্বারা পরিচালিত আচরণই হল সম্যক্ কর্ম।

৫। সম্যক্-আজীব (সম্মা আজীব): যে জীবিকা দ্বারা অন্য কোন প্রাণীর অনিষ্ট হয় না, অর্থাৎ অসৎ পথ বর্জন করে নির্দোষ, নিষ্পাপ জীবিকা অর্জন করতে হবে।

৬। সম্যক্-ব্যায়াম (সম্মা ব্যায়ামো): সঠিক চিন্তার অনুশীলন ও কুচিন্তা বর্জনের জন্য দেহ মনের নিয়ত প্রচেষ্টাই হল সম্যক ব্যায়াম। "গয়ার বোধিদ্রুম মূলে বসে যে মানসিক প্রচেষ্টা দ্বারা, যে বলবতী ইচ্ছার দ্বারা বোধিসত্ত্ব বুদ্ধত্ত্ব লাভ করেছিলেন, তাই সম্যক প্রচেষ্টা"।[২]

৭। সম্যক্-স্মৃতি (সম্মা সতি): প্রতি মূহুর্তে কায় ও মনে যে সকল অবস্থা উৎপন্ন হয়, অতি সজাগ দৃষ্টিতে সন্তর্পণে সেগুলিকে মনে মনে পর্যবেক্ষণ করাই হল সম্যক স্মৃতি।[৩]

৮। সম্যক্-সমাধি (সম্মা সমাধি): উক্ত ৭টি অঙ্গ সঠিকভাবে পালিত হওয়ার পর সাধক একাগ্র চিত্তে একটি বিষয়ে মনোনিবেশ করে, একেই বলা হয় সম্যক্ সমাধি।

এই আটটি মার্গ অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তি দৈনন্দিন কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হবে। এর মাধ্যমেই ধীরে ধীরে ব্যক্তি নির্বাণ প্রাপ্তির জন্য প্রস্তুত হবে। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গকে প্রজ্ঞা, শীল, সমাধিরূপেও বর্ণনা করা হয়। অষ্টাঙ্গিক মার্গের প্রথম ও সপ্তম মার্গ (সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক স্মৃতি) প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের অন্তর্গত, সর্বশেষ মার্গ সম্যক্ সমাধির অন্তর্গত এবং বাকি পাঁচটি মার্গ 'শীলের' অন্তর্গত। এদের একত্রে পঞ্চশীল বলা হয়। এই তিনটি ভাগ সম্পর্কে ধম্মপদের বুদ্ধবর্গে বলা হয়েছে:

"সব্বপাপস্সা অকরণং কুসলস্স উপসম্পদা,
সচিত্ত পরিয়োদপণং এতং বুদ্ধানুসাসনং।" [৪]

অর্থাৎ, সকল পাপ থেকে বিরতি (শীল), কুশল কর্মের পূর্ণতা সাধন (প্রজ্ঞা) এবং নিজের চিত্তে বিশুদ্ধিকরণ, এটি বুদ্ধদেবের উপদেশ।

**'শীল' শব্দের তাৎপর্য:** বৌদ্ধ নৈতিকতায় শীলের গুরুত্ব সর্বাধিক। বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'শীল' শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করা হলেও বৌদ্ধ শাস্ত্রে 'শীল' শব্দটি সৎ আচরণ বা সৎ চরিত্র অর্থেই বিশেষত ব্যবহৃত হয়েছে। আবার নীতি বলতেও সৎ আচরণকেই বোঝানো হয়। শীল হল বাক্যে ও কর্মে নৈতিক নিয়মের অনুবর্ত্তিতা। কিন্তু কায়িক বা বাচিক যে কোনো আচরণের পশ্চাতেই চেতনা থাকে অর্থাৎ চিন্তা করেই মানুষ ভালো-মন্দ কর্ম সম্পাদন করে। সুতরাং শীল শব্দের দ্বারা কায়িক, বাচিক ও মানসিক কর্মের পরিশুদ্ধিকেই বোঝায়। ভগবান বুদ্ধ গৃহীদের জন্য পাঁচটি শীল তথা পাঁচটি নীতির কথা বলেছেন যথা:

১। পানং ন হানে: প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকবে।

২। ন চাদিন্নমাদিয়ে: অদত্তদ্রব্য গ্রহণ করবে না।

৩। মুসা ন ভাসে: মিথা কথা বলবে না।

৪। ন চ মজপ্পোসিয়া: মাদকদ্রব্য গ্রহণ করবে না।

৫। ব্রহ্মচারিয়ঞ্চ মঙ্গলমুত্তম্: কামনা বাসনাকে দমন করবে।

এখান থেকে স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়, পঞ্চশীলকে কেবল নঞর্থকভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, প্রতিটি শীলের মধ্যে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গিও রয়েছে। পাঁচটি শীল সদর্থকভাবে উল্লেখ করলে বলা যায় –

১। সব জীবের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করবে।
২। শ্রদ্ধাচিত্তে সজ্জন ব্যক্তি ও প্রকৃত দুঃখী ব্যক্তিকে দান করবে।
৩। সত্য কথা বলবে, পরোপকার চিত্তে কথা বলবে।
৪। পরনারীকে পত্নীসম, ভগ্নীসম এবং কন্যাসম মনে করে তার প্রতি শ্রদ্ধা, স্নেহ, প্রীতি প্রদর্শন করবে।
৫। নেশামুক্ত জীবন যাপন করবে।

সদর্থক ও নঞর্থক এই দুটি দিককে দুই প্রকার শীলের অন্তর্গত বলা যেতে পারে। "চারিত্র ও বারিত্র বশে শীল দ্বিবিধ"।[৫] যা করা কর্তব্য বলে ভগবান বুদ্ধ নির্দেশ করেছেন তা চারিত্র এবং যা অকর্তব্য বলে ভগবান বারণ করেছেন তা বারিত্র। সুতরাং বলা যায়, পঞ্চশীলের নঞর্থক দিকটি হল বারিত্র শীল এবং সদর্থক দিকটি হল চারিত্র শীল।

এছাড়াও শ্রাবক অর্থাৎ যেসব মানুষ সংসারে থেকেও উচ্চপর্যায়ের সাধনা করতে চান, তাদের জন্য বুদ্ধদেব আরও তিনটি শীলের উল্লেখ করেছেন যথা:

৬। অসময়ে খাদ্যগ্রহণ করবে না। মূলত সংযমের অভ্যাস গঠনের জন্যই এই শীল।
৭। উত্তেজক নাচ, গান এবং বিলাসিতা থেকে বিরত থাকবে। এর ফলে ব্যক্তির মধ্যে স্বার্থপরতা নাশ হয়ে মৈত্রী ও করুণার পথ প্রশস্ত হবে।
৮। দুর্জনের সেবা না করে সজ্জনব্যক্তির সেবা করবে।

এই আটটি শীল সংসারী মানুষদের জন্য নির্ধারিত হলেও মঠবাসী ভিক্ষু ও শ্রমণদের জন্য এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরো দুটি শীল যা তুলনামূলকভাবে কঠোর:

৯। নরমশয্যা ত্যাগ করে কাষ্ঠাসনে বসতে হবে।
১০।সাংসারিক ভোগবিলাস বর্জন করে দীনদরিদ্রের সঙ্গে নিরাড়ম্বর জীবনযাপন করতে হবে।

কাজেই দেখা গেল, অষ্টশীল এবং দশশীলের মধ্যে একটা পর্যায়ভেদ রয়েছে। সংসারে আবদ্ধ মানুষ এবং সংসারত্যাগী শ্রমণ উভয়ই যাতে নিজ নিজ জীবনে সদাচার পালন করে নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হতে পারেন, তার জন্য অষ্টশীল এবং দশশীল – এই দুটি পর্যায়ে শীলের কথা বলা হয়েছে। উক্ত শীলগুলিকে গৃহের ভিত্তির সঙ্গে তুলনা করা যায়। গৃহের ভিত ঠিক মতো প্রস্তুত না হলে গৃহনির্মাণ যেমন সঠিকভাবে হয় না, তেমনি শীলগুলি সঠিকভাবে পালিত না হলে সচ্চরিত্র গঠন সম্ভব হয় না। তাই শীলগুলিকে সচ্চরিত্র গঠনের সোপান বলা যেতে পারে। অষ্টশীল আচরণের দ্বারা গৃহীদের নির্বাণলাভ হবে এমন নয়। তা আসলে নির্বাণ লাভের মার্গ বা পথ। এর মাধ্যমে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য এই ষড়রিপু দমন করে দয়া, সন্তোষ, সততা প্রভৃতি গুণগুলির বিকাশ ঘটানো সম্ভব। সুতরাং শীলকে চরিত্র গঠনের নৈতিক আলোচনার লক্ষ্যস্থল বলা যেতে পারে।

**মধ্যমপন্থা অবলম্বন:** বৌদ্ধ নৈতিকতার অন্যতম স্তম্ভ হল মধ্যমপন্থা। মধ্যমপন্থার মূল কথা হল, পশুবলি, যাগযজ্ঞ, পূজা-আয়োজন ইত্যাদি অনুষ্ঠান কিংবা স্বল্প আহার গ্রহণ, উপবাস প্রভৃতির মাধ্যমে কৃচ্ছসাধন – এদুটির কোনোটিই মুক্তির পথ হতে পারে না। একথার মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেব তাঁর নীতিতত্ত্বে সম্পূর্ণ এক নতুন পথের দিশা দেখালেন। সেই পথে বলা হয়েছে, নিজের কর্তব্য পালনের জন্যই নিজের শরীরের রক্ষা করা প্রয়োজন, কিন্তু তার জন্য খাদ্য, বস্ত্র এসব নিয়েই নিমগ্ন থাকা কাম্য নয়। সংসারী মানুষকে তার প্রয়োজনীয় বিষয়টুকুতে এবং ভিক্ষুকে ভিক্ষালব্ধ অন্নবস্ত্রেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। দৈবশক্তির আরাধনা এবং কৃচ্ছসাধন – এই দুই চরমপন্থী পথ পরিহার করে বুদ্ধদেব মধ্যবর্তী এক পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। তাই এটিকে মধ্যমপন্থা নামে অভিহিত করা হয়। মানুষ নিজের চেষ্টাতেই এই পথ অনুসরণ করে আত্যন্তিক দুঃখমুক্তিলাভ করতে সমর্থ। দুঃখমুক্তির জন্য মধ্যমপথ প্রবর্তন এবং মানুষের অন্তরের ইচ্ছাশক্তির উপর গুরুত্ব স্থাপন কেবলমাত্র সমসাময়িক পটভূমিকাতেই নয়, আধুনিক সমাজের প্রেক্ষাপটেও অনেক বেশি মানবিক ও ব্যবহারপযোগী বলতে হয়।

নৈতিক দিক থেকে মধ্যমপন্থার গুরুত্ব যেমন রয়েছে, একইভাবে দার্শনিক দিক থেকেও মধ্যমপন্থা যথেষ্ট তাৎপর্য্যপূর্ণ। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই মতবাদের অর্থ হল – শাশ্বতবাদ (জগতের সকল কিছুই শাশ্বত, অবিনশ্বর) এবং উচ্ছেদবাদ (জগতের সকল কিছুই নশ্বর) এই দুই চরমপন্থী মতবাদের বিরোধিতা করে জগতের অনিত্যতাকে উপলব্ধি করা। এই উপলব্ধি সম্ভব হবে অন্তরের দুর্বলতা, ভয়, ভ্রান্তি, দোষ – এ সমস্ত কিছু অবসানের মধ্য দিয়ে। তবে তার জন্য কোন তত্ত্বানুসন্ধান নয়, চারিত্রিক ও মানসিক উন্নতি একান্ত প্রয়োজন। এর মাধ্যমে চিত্তের বিশুদ্ধিকরণ ও দুঃখের চিরকালীন মুক্তি ঘটবে যা বৌদ্ধ নীতিতত্ত্বের মূল লক্ষ্য। সুতরাং মধ্যমপন্থার দার্শনিক প্রেক্ষাপট থেকেই তার নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসৃত হয়েছে বলা যায়।
সমাজের সাধারণ মানুষের পক্ষে তুলনীয়ভাবে বুদ্ধ নির্দেশিত সহজসাধ্য মধ্যপথই অন্যান্য গূঢ় দর্শন এবং ধর্মচিন্তা, কঠোর সন্ন্যাস বা ভোগবিলাসের জীবন থেকে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য মনে করাই স্বাভাবিক।

**দুঃখমুক্তির সহজ পাঠ:** দুঃখমোচনের মাধ্যমে পরমশান্তি লাভের পথ আবিষ্কার করে তা প্রচারের উদ্দেশ্যে মহাপুরুষ বুদ্ধ যখন লোকসমাজে এসে উপস্থিত হলেন তখন সমাজের নানা স্তরের মানুষ তাঁর শরণাপন্ন হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গ, তাঁর চরিত্র, তাঁর বাণী মানুষকে পরম শান্তি দান করেছিল। আশ্চর্যের বিষয় এটিই যে, তিনি কখনই মানুষের কাছে ঈশ্বরের নামগান বা কোন দৈব শক্তির মাহাত্ম্য প্রচার করেন নি। আত্মা, পরমাত্মা বা জগতের জটিল তত্ত্বকে তিনি একেবারেই আমল দেননি। তাহলে কোন্ আকর্ষনে সমাজের ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ সকলেই তাঁর ধর্ম আগ্রহ সহকারে স্বীকার করেছিল? আসলে বুদ্ধদেব মানুষের মনে জাগ্রত করেছিলেন সর্বজীবকে প্রেম-ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করার মন্ত্র। এ প্রসঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা – এই চারটি ভাবনার কথা পাওয়া যায় যা ব্রহ্মবিহার নামে পরিচিত। মৈত্রী অর্থাৎ নিয়ত জীবের কল্যাণ চিন্তা, করুণা অর্থাৎ জীবের দুঃখমোচনের বাসনা, মুদিতা অর্থাৎ পরের সুখে তৃপ্তিলাভ এবং উপেক্ষা হল সুখ-দুঃখের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে বিশ্বমানবের কল্যাণ কামনা করা। এদের মধ্যে মৈত্রী ভাবনাই মুখ্য, যেহেতু অন্যান্যগুলি পরোক্ষভাবে মৈত্রীরই অন্তর্গত। বিশ্বমানবের দুঃখ অনুভব করতে হলে এবং দুঃখমুক্তির পথ অন্বেষণ করে দুঃখ নিরোধ করতে হলে তা একমাত্র মৈত্রী ও করুণার মাধ্যমেই সম্ভব। বুদ্ধদেবের মতে, মৈত্রী ভাবনায় বিশ্ববাসীর কল্যাণে প্রথমেই প্রয়োজন স্বার্থত্যাগ এবং এটি সম্ভব হবে একমাত্র আত্মপ্রচেষ্টা ও আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে। হরিশংকর প্রসাদ বলেছেন – "…Buddha maximum emphasis on the self-effort and self-realization in the matter of moral development of

person. This development, according to him, envisages the true manifestation of human nature which in its essence endowed with loving, kindness, compassion, sympathetic joy and equanimity."[৬]

বৌদ্ধ মতে জাগতিক দুঃখের মূল কারণ হল ইপ্সিত বস্তুর প্রতি প্রবল আকাঙ্খা। কাঙ্খিত বস্তুর প্রাপ্তি না হলেই জন্ম হয় হিংসার, ক্রোধের। বুদ্ধদেবের মতে, হিংসাকে দমন করার অস্ত্র হিংসা নয়, অহিংসার মনোভাব, একইভাবে ক্রোধকে দমন করতে হবে অক্রোধ দিয়ে। আর তার প্রথম পদক্ষেপই হল স্বার্থত্যাগ করে অপরের সুখে তৃপ্তিলাভ। কিন্তু জগতের এত কাঙ্খিত বস্তুর সম্ভার থেকে নিজের লোভ, কামনা, বাসনাকে সংযত করে বিশ্ববাসীর কল্যাণ চিন্তার এই মহান ভাবনার বাস্তবায়ন কি সম্ভব? আরো বড় প্রশ্ন হল, নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে অপরের সুখে সুখলাভ করা কি সহজসাধ্য? – এধরনের প্রশ্ন আপাতভাবে আমাদের মনে উঁকি দিতে পারে। বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ করলে জানা যায় যে, সেই পথের নির্দেশও তথাগত করেছেন। তাঁর মতে অপরের সুখে সুখলাভ তখনই সম্ভব হবে যখন ব্যক্তি অন্যের সুখকেও নিজের সুখের মতো গ্রহণ করবেন। এই প্রসঙ্গে তথাগতের সেই বাণী স্মরণ করতে হয় – *অত্তানম্ উপমংকত্বা* অর্থাৎ অন্যকে নিজের সদৃশ ভেবে আঘাত বা হত্যা করবে না।[৭] এরফলে স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তি এমন কোনো কাজে লিপ্ত হবে না যা অন্যের অনিষ্ট করবে। কারণ অন্যের ক্ষতি করার সময় তার মনে সর্বদা এই ভাবনা আসবে যে ঐ স্থানে সে নিজে থাকলে তারও এরূপ অনিষ্ট হতো। এতে একদিকে যেমন ব্যক্তির মধ্যে স্বার্থপরতার মনোভাব দূর হবে, অন্যদিকে তার মধ্যে অন্যায় বা পাপকর্ম করার চিন্তা জাগ্রত হবে না।

বুদ্ধসম্মত এই পথে সত্যিই যদি আমরা নিজেদের জীবনকে চালনা করতে পারি অর্থাৎ অন্যের পরিস্থিতিকে, অন্যের দুঃখকষ্টকে নিজের মনে করে তাদের কল্যাণে সচেষ্ট হই তাহলে অপরের এবং একইসঙ্গে নিজে দুঃখ মোচনের পথকেও প্রশস্ত করতে পারবো। আর এর মাধ্যমেই বর্তমান সমাজের সঙ্গেই আগামী দিনের পৃথিবীও হিংসা-দ্বেষ-ক্রোধ মুক্ত হয়ে মৈত্রী ও করুণার ধারায় শুদ্ধ হবে।

**সর্বজনীন নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা ও 'পাতিমোক্ষ' অনুসরণ:** বিনয়পিটকের মহাবগ্গে বোধিলাভের পরে বুদ্ধদেব তাঁর ধ্যানলব্ধ মহাসত্য কীভাবে উপলব্ধি করেছিলেন তার কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। বোধিলাভের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহে মুক্তির বিমল আনন্দ অনুভব করার পর তৃতীয় সপ্তাহে মুচলিন্দ বৃক্ষের নীচে তিনি তাঁর সাধনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। সেই উদান গাথা ত্রিপিটকের অন্তর্গত বিনয়পিটকের মহাবগ্গের মুচলিন্দ কথাতে উল্লিখিত হয়েছে:

"সুখ বিবেকো তুট্ঠস্স সুতধম্মস্স পস্সতো,
অব্যাপজ্ঝং সুখং লোকে পাণভূতেসূ সংযম
সুখা বিরাগতা লোকে কামানং সমতিকম্মো,
অস্মিমানস্স ষো বিনয়ো এতং পরমং সুখং"। [৮]

অর্থাৎ যিনি সকল বিষয়ে সন্তুষ্ট, ধর্মজ্ঞাত, যিনি সত্যের সাক্ষাৎলাভ করেছেন তার বিবেক সুখকর। সর্বভূতে মৈত্রী ও অহিংসা সুখকর। এই পৃথিবীতে অনাশক্তি ও কামহীনতা সুখকর, কিন্তু অহংবোধের বিলোপই পরম সুখ। এই বিমুক্তি সুখ বুদ্ধদেব কেবল নিজেই সম্ভোগ করেছিলেন তা নয়, তিনি তাঁর সদ্ধর্মের অমৃতবাণী লোকসমাজে প্রচার করার সংকল্প দিয়েছিলেন। কিন্তু এই বৃহৎ সত্য সকলের বোধগম্য

করে তুলতে হলে তাঁর প্রচারের পথকে হতে হবে সহজ, সাধরণ। সেই কারণে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে তিনি প্রাকৃত জনের ভাষায় সহজভাবে তাঁর বক্তব্য প্রদান করেছিলেন যা সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। বুদ্ধদেব স্বয়ং যাদের কাছে তাঁর নীতিকথা ব্যাখ্যা করেছেন তাদের অধিকাংশ ছিল অনার্য্য ও অশিক্ষিত। তাই বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সাধারনের ভাষায় সরস ব্যাখ্যা প্রদান করে বুদ্ধদেব সেই সকল শিষ্যদের ধম্মোপদেশ দিতেন। আবার যেসব পণ্ডিত, জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর শরণাপন্ন হতেন, তিনি তাদের জন্য উচ্চ পর্যায়ের ভাষায় শিক্ষাদান করতেন। সুতরাং ভগবান বুদ্ধের নৈতিক শিক্ষাদানের ভাষা কেবল মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মানুষদের জন্যই নয়, তা সমাজের অন্যান্য স্তরের মানুষদের উদ্দেশ্যেও ব্যবহৃত। সমাজের কোন্ পর্যায়ের মানুষ কী ধরণের ভাষা বুঝতে সমর্থ, সেই বিষয়ে সচেতন হয়ে বুদ্ধদেব এক এক ধরণের মানুষের কাছে এক এক ভাবে ধম্মব্যাখ্যা করতেন। শাস্ত্রজ্ঞানহীন শ্রোতারা যাতে উপদেশগুলি মনে রাখতে পারেন সেজন্য এক কথা বারংবার বলতেও তিনি দ্বিধাবোধ করতেন না। ছোট বড়, পণ্ডিত মূর্খ, সাধু-অসাধু, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, আর্য্য-অনার্য্য নির্বিশেষে সকলের দুঃখমোচনের চিন্তায় সকলের উপযুক্ত ভাষায় বুদ্ধদেবের যে বক্তব্য প্রদান, তা সত্যিই বৌদ্ধ নৈতিকতার অনন্যতার পরিচায়ক। সর্বজীবের কল্যাণচিন্তায় নীতিশিক্ষা দানের মাধ্যম ও তার ভাষার প্রতি গৌতম বুদ্ধের এই সচেতনতা পরোক্ষভাবে সমাজের জন্য এই বার্তা বহন করে যে, সংকীর্ণ স্বার্থ চিন্তা নয়, আমাদের লক্ষ্য হোক বৃহত্তর জনসমষ্টির মহত্তম কল্যাণ।
দুঃখ উপশমে তথাগত এমন এক সদাপ্রসন্ন রূপ লাভ করেছিলেন যে তাঁকে দর্শন করে মানুষের হৃদয় শ্রদ্ধায় অবনত হত। কৌন্ডিণ্য, ভদ্রীয়, বাষ্প, মহানাম ও অশ্বজিৎ - এই পাঁচজন সত্যানুরাগী সাধককে নিয়ে গড়ে উঠলো সংঘ। ধীরে ধীরে সেখানে সমাগম হল অগণিত শিষ্যের। কিন্তু এই শিষ্যমণ্ডলী কিসের আশায় সাংসারিক সুখভোগ ত্যাগ করে সংঘে মিলিত হলেন? আসলে বুদ্ধদেবের অন্তর্নিহিত অপার প্রেমই ছিল এই মিলণের সূত্র। কেবলমাত্র সাংসারিক ভোগ বা সংসার বর্জনই নয়, সংঘে প্রবেশের পর ভিক্ষুদের আচার ব্যবহারে উশৃঙ্খলতা, কর্মে শিথিলতা প্রভৃতি বর্জনের শিক্ষাও গ্রহণ করতে হত। তার জন্য নির্ধারিত হয়েছিল কতগুলি নিয়ম যাকে বৌদ্ধ পরিভাষায় 'পাতিমোক্ষ' বলা হয়। 'পাতি' অর্থে 'অভিমুখে' (towards) এবং 'মোক্ষ' অর্থে 'নির্বাণ' (Liberation)। বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটকের বিনয়পিটকে পাতিমোক্ষের উল্লেখ পাওয়া যায়। পাতিমোক্ষ বলতে বোঝায় সংঘের ভিক্ষু (Monk) এবং ভিক্ষুনীদের (Nun) উদ্দেশ্যে রচিত আচার-আচরণ সংক্রান্ত কতগুলি বিধান (Code of Conduct) যা বুদ্ধদেবের উপদেশাবলীর ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। কোন ভিক্ষুর প্রতি দুর্বাক্য ব্যবহার করা, নিন্দা করা, কাউকে হত্যা করা, চুরি করা, কারো প্রতি দোষারোপ, অযথা বাক্‌বিতণ্ডা, কাউকে আঘাত করা, অথবা অযথা কাউকে বহিষ্কার করা – এসব ছিল বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। এছাড়াও সুষ্ঠভাবে, শান্তভাবে খাদ্যগ্রহণ, বহির্বাস ও অন্তর্বাস দ্বারা সকল অঙ্গ আবৃত রাখা, সকলের সামনে সোজা হয়ে বসা, দানের আহারটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকা, নিজের ভিক্ষান্ন অন্য ভিক্ষুদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া – এরকম ছোট-বড়ো অনেক বিধিনিষেধের উল্লেখ পাতিমোক্ষে করা হয়েছিল যা সংঘের সদস্যদের মেনে চলতে হত। ভিক্ষুদের জন্য পাতিমোক্ষের সংখ্যা ২২৭টি এবং ভিক্ষুণীদের জন্য ৮৪টি। এই সকল নিয়মের মধ্য দিয়ে শিষ্যদের মূলত যে শিক্ষা দান করা হত তা হল চিত্তকে সংযত করা, সংঘ ও সমাজের মধ্যে সর্বত্রই ভদ্র আচরণ করা এবং অপরের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব জাগ্রত করা।

ওপরের আলোচনা থেকে বৌদ্ধনীতি সম্পর্কে সংক্ষেপে একথাই বলা যায়, বৌদ্ধ সাধনা হল ভোগ-বাসনা বর্জনের এবং ভদ্রতা, লৌকিকতা, আধ্যাত্মিকতা গ্রহণের সাধনা। বুদ্ধদেব পদে পদে তাঁর শিষ্যদের সংযমের সূত্রে বাঁধবেন, তা সত্ত্বেও দলে দলে মানুষ তাঁর শরনাপন্ন হয়েছিল কেন? উত্তরে বলতে হয়

নির্বাণ নামক অমৃতলাভের জন্য তথাগত তার শিষ্যদের সাধনার যে পথ নির্দেশ করেছেন তা হল ইন্দ্রিয়কে ত্যাগ করার পথ। ইন্দ্রিয়বিজয়ের মধ্যে দিয়ে সাধক হবেন নির্ভীক ও নিষ্পাপ চিত্তের অধিকারী। তবে এর জন্য সাধককে যে ত্যাগ করতে হয় সেই ত্যাগে দুঃখ নেই, আছে অপার আনন্দ। আবার এর মাধ্যমে তিনি যখন সমস্ত কামনা, বাসনা, লোভ, তৃষ্ণাকে জয় করতে পারেন, তখন যেই জয়ললাভের রয়েছে পরম শান্তি। মনের সমস্ত কলুষতা, সমস্ত পাপ পরিহার করে তিনি যে সুখলাভ করেন তা ভোগের সুখ নয় তা ত্যাগের সুখ, সংযমের সুখ। এই সুখকেই পরম আনন্দ বা নির্বাণ বলে বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রকাশ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ধর্ম্মপদে ভিক্ষুবর্গে উক্ত হয়েছে:

"মেত্তাবিহারী যো ভিক্খু পসন্নো বুদ্ধ সাসনে।
অধিগচ্ছে পদং সন্তং সঙ্খারূপসমং সুখং।।" [৯]

অর্থাৎ বুদ্ধের অনুশাসনকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করে সকল জীবের সুখ ও কল্যাণভাবনার মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করতে করতে যখন তার বাসনার উপশম হবে, তখন তিনি নির্বাণলাভ করবেন।

## বৌদ্ধ নীতির অভিনবত্ব

**আত্মপ্রচেষ্টা ও মৈত্রীভাব অনুসরণ:** বৌদ্ধধর্মনীতির আলোচনায় আমরা একটি বিষয় খুব স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করলাম যে, এই নীতি কোনো পরম্পরা প্রথা বা কোন অতিলৌকিক শক্তি নির্ভর নয়। আমাদের কুশল-অকুশল সমস্ত আচরণের উৎস আমাদের মন। চিত্তকে লোভ, ঘৃণা, অহংবোধ থেকে বিরত রেখে মৈত্রী করুণার ভাবধারায় পরিশুদ্ধ করাই বৌদ্ধধর্মের লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যকে অর্জন করতে সমর্থ হলেই ব্যক্তির মধ্যে নৈতিকতার উন্মেষ ঘটবে। আর এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ ব্যক্তি নিজের চেষ্টাতেই প্রশস্ত করবে সম্পূর্ণ প্রসন্ন চিত্তে, কোন ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারা বা বলপূর্বক নয়। সেইকারণে এই নৈতিক নিয়মের সর্বাপেক্ষা বড়ো গুরুত্ব হল – এক্ষেত্রে ব্যবহারিক জীবনকে অতিক্রম করে পারমার্থিক স্তরে উন্নীত হওয়ার পথনির্দেশ রয়েছে কিন্তু তা কোন সামাজিক রীতিনীতি, সাংস্কৃতিক পরম্পরা (Cultural Tradition) বা লৌকিকতার জন্য সীমাবদ্ধ নয়। বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ কিংবা বিধিমুক্ত, যেকোনো সামাজিক প্রেক্ষাপটেই এই নৈতিক নিয়ম প্রযোজ্য।

বৌদ্ধ ধর্মে অন্যান্য ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন ও অভিনব চিন্তাধারা উদ্ভুত হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মনীতির অন্যতম ভিত্তি ব্রহ্মবিহার ভাবনা সর্বপ্রকার নৈতিক আচরণের মান পরিমাপের সাধারণ মানদণ্ড। আমরা দেখি নীতিবোধ সম্পর্কে, জগৎ সম্পর্কে, ধর্ম সম্পর্কে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মত অবলম্বন করা হয়। কোথাও অন্তর্দৃষ্টির (Psychological Insight) ওপর ভিত্তি করে উঠেছে নীতিতত্ত্ব, কোথাও আবার সম্পূর্ণ অতিন্দ্রীয় ধ্যান ধারণাকে কেন্দ্র করে নীতিতত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে। আবার কোনো ক্ষেত্রে জগতের কার্যকারণ সম্পর্কের ব্যাখ্যায় ঐশ্বরিক শক্তির বন্দনা করা হয়েছে। তবে এই সকল ক্ষেত্রেই প্রথমেই মানুষের হৃদয়কে করুণা, মৈত্রী, ভালোবাসায় পূর্ণ করে তোলার উপদেশ দেওয়া হয়। মানুষ পৃথিবীর যে কোন ধর্ম, যেকোন নীতিই গ্রহণ করুক না কেন সেই নীতিপথ সঠিকভাবে অনুসরণ করতে হলে সর্বপ্রথম চিত্তে জাগ্রত করতে হবে অন্যের প্রতি করুণাভাব, শ্রদ্ধাবোধ। এই কারণেই বিমুক্তি সুখ লাভের পর ভগবান বুদ্ধের মুখ থেকে যে অশ্রুতপূর্ব আশ্চর্য গাথাটি উচ্চারিত হয়েছিল তা লিপিবদ্ধ রয়েছে বিনয়পিটকের মহাবর্গের ব্রহ্মার যাচনঞ্চা কথাতে –

"অপরূপতা তেসং অমতস্স দ্বারা

যে সোতবন্তো পমুঞ্চন্ত সদ্ধং,
বিহিংসসঞ্ঞী পগুণং ন ভাসিং,
ধম্ম পণীতং মনুজেসু ব্রহ্মে"।[১০]

অর্থাৎ অমৃতের দুয়ার খুলিয়া গিয়াছে। যাহাদের কান আছে তাহারা শোন। শ্রদ্ধা দ্বারাই এই অমৃতের সাক্ষাৎকারলাভ হইবে। এই বাণী ভারতবর্ষের চিরন্তন বাণী বলেই মনে করা হয়। ধম্মের যে মূলতত্ত্ব তিনি ব্যাখ্যা করেছেন তা নিজের নতুন সৃষ্টি বলে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেননি। তিনি যেন হারানো ধন খুঁজে বের করে তা মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

**ব্যক্তি কল্যাণের মধ্য দিয়েই সমাজ কল্যাণ সম্ভব:** এই ধর্মে কেবল প্রেম, প্রীতি ও মৈত্রীপূর্ণ আচরণের শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে তা নয়। কোন ব্যক্তির অন্যের প্রতি এরূপ আচরণ তখনই প্রদর্শিত হবে যখন সে নিজের মধ্যে সেগুলির অনুভূতি অর্জন করবেন। সেজন্য প্রত্যেক মানুষের নিজের চিত্তের সংযম পরিশুদ্ধির প্রতি বৌদ্ধধর্মে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। আধুনিক সমাজে এর সবচেয়ে বড় অবদান হল- এই ধর্মনীতি সামাজিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় প্রভাব ত্যাগ করে ব্যক্তিকে স্বনির্মিত পথে জীবনে আনন্দ ও হৃদয়ে শান্তির পথ দেখিয়েছে। এক্ষেত্রে অবশ্য মনে হতে পারে যে, বৌদ্ধমত সম্পূর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। কিন্তু এই অভিযোগ সঠিক নয়। কারণ বুদ্ধদেব মনে করতেন, একজন অন্ধ ব্যক্তি যেমন অপর অন্ধব্যক্তিকে পথ দেখাতে পারে না, তেমনি যে মানুষ নিজেই লোভ, হিংসা, কামনা-র পাঁকে নিমজ্জিত রয়েছে, সে কখনই অপর ব্যক্তিকে সেই পাঁক থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। তাই অন্যের চিত্তকে কলুষতা মুক্ত করতে হলে সর্বাগ্রে নিজের চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন। এই উপদেশ বুদ্ধদেব যে নিজের জীবনেও অনুসরণ করেছিলেন তা তাঁর জীবনী পাঠ করেই জানা যায়। সেখানে বলা হয়েছে বিশ্বের কল্যাণ ও সত্যান্বেষণের জন্য এক গভীর রাত্রে কন্থকের (সিদ্ধার্থ যে ঘোড়ায় চেপে গৃহত্যাগ করেছিলেন) পিঠে চেপে সারথি ছন্দককে সঙ্গে নিয়ে চিরকালের জন্য গৃহত্যাগ করলেন। একসময় তাঁরা এসে পৌঁছালেন অনোমা নদীর তীরে। নিজের বহুমুল্য অস্ত্র ও আভূষণ ত্যাগ করে সিদ্ধার্থ মনস্থির করলেন যে, এই নদীর তীরেই তাঁর প্রবজ্যা হবে। সারথী ছন্দক সেই সময় সিদ্ধার্থের সঙ্গে প্রব্রজ্জিত হতে চাইলে তিনি সেই অনুরোধ প্রত্যাখান করে বলেন, 'এ পথ বড়ই কঠিন, বড়ই বন্ধুর, আমার জীবন দিয়ে তাকে আমি সত্যান্বেষণের একটি কল্যাণময় পথ তৈরি করে দিতে চাই, তারপর সবাইকে সেই শান্তির নীড়ে আস্তে আহ্বান করব'। সুতরাং ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যেকার সম্পর্ককে বুদ্ধদেব অস্বীকার করতে চাননি। তাঁর মতে আমরা একটা সুন্দর পৃথিবীর অধিকারী হতে পারবো যখন সেই পৃথিবীর মানুষ সুন্দর হবে। তাই বৌদ্ধনীতিকে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বলা যায় না। বরং বলতে হয় যে, এক্ষেত্রে সমাজকল্যাণের সোপান হিসাবেই ব্যক্তিকল্যাণের কথা বলা হয়েছে।

**পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ মোকাবিলা:** বৌদ্ধধর্ম যে সমাজ ব্যবস্থায় জন্ম নিয়েছিল তার সব ধ্যান-ধারনাকে বুদ্ধদেব গ্রহণ করেননি। সমাজে প্রচলিত নানা অন্যায়, অবিচার, কুপ্রথা দমন করে সমাজের পুনর্গঠনের জন্য তিনি অবশ্য কোন সামাজিক বিবর্তনের অপেক্ষাতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তৎকালীন সমাজে সমস্ত অন্যায়ের সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবেই মোকাবিলা করেছিলেন। তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হল - জাতিব্যবস্থার বিরোধিতা। তৎকালীন সমাজে প্রচলিত জাতিপ্রথার বিরোধিতা করে বুদ্ধদেব বলেন, সংঘে প্রবেশ করার পর মানুষের জাতিগত কোন পরিচয় থাকবে না। সে তখন শুধুই ভিক্ষু বলে পরিচিত হবে। তিনি বলতেন জন্মের দ্বারা কেউ ব্রাহ্মণ হয় না, হয় কর্মের দ্বারা। "ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব তিনি মানিতেন, তবে সাধারণ লোক যাহাকে ব্রাহ্মণ

বলে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জাতির সন্তান মাত্রেই ব্রাহ্মণ, অতএব শ্রেষ্ঠ, একথা তিনি মানিতেন না। সত্য ও ধর্ম যে পালন করে সে যে বংশেই জন্মগ্রহণ করুক বুদ্ধের দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হইত"।[১১] তিনি একজন মেথরকে ও কুকুর খাদককে তাঁর ধর্মে দীক্ষিত করেন, যারা পরে স্বনামধন্য ভিক্ষুতে পরিণত হয়েছিলেন। সংঘে নারীদের প্রবেশাধিকার নিয়ে এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের নিজেদের জন্য একটি নিয়ম তৈরি করে বুদ্ধদেব তাঁর সংঘকে সর্বজনীন করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। এর মাধ্যমে সমাজে পুরুষ ও নারীজাতির মধ্যে যে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ তার প্রভাব অনেকখানি হ্রাস পেয়েছিল। তাঁর এই প্রতিবাদী মনোভাব আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, অন্যায় বা যে কোন সামাজিক দুরাবস্থার মোকাবিলা সেই সমাজে থেকেই প্রত্যক্ষভাবে করতে হবে, মন্থর গতিতে হওয়া সামাজিক বিবর্তনের মাধ্যমে নয়। হরিশঙ্কর প্রসাদের মতে, "…moral behavior of a person is supposed to be guided by only one factor. i.e. the immediate concern in a given situation which demands immediate expression of one moral practice. This kind of concern rejects the demand of irrelevant and false notion of such identities like religion, caste, creed, ideology, nationality and gender." [১২]

**প্রাসঙ্গিকতা:** বৌদ্ধনীতিতত্ত্বের যে আলোচনা এখানে করা হল তার থেকে এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে উঠে আসে যে, বৌদ্ধধর্মের মূল নীতি হল- অহিংসা, মৈত্রী, সাম্য ও প্রীতির বন্ধনে সবাইকে আবদ্ধ করে সকলের জীবনে শান্তির প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করা। বুদ্ধদেব যে মূল্যবোধের শিক্ষা প্রদান করেছেন তা সকল মানবজাতির জন্যই প্রযোজ্য। তৎকালীন সমাজে এই শিক্ষা যেমন প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক ছিল, তেমনি আজকের সামাজিক অবস্থাতেও এই নীতিতত্ত্বের আলোচনা যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। গৌতম বুদ্ধ বলেছিলেন, মানুষ মৈত্রীপরায়ণ হবে, ক্ষমাশীল হবে, লোভ ও মোহহীন হবে। মানুষ মানুষকে শ্রদ্ধা করবে, সম্মান করবে, একে অন্যের গুণের প্রশংসা করবে। কিন্তু আজ আমরা সম্পূর্ণ এর বিপরীত ঘটনা দেখতে পাই। বিশ্বের সব স্থানেই আজ এক অস্থিরতা, হিংসা ও সংঘাতের রাজনীতি বিরাজ করছে। প্রতি মুহূর্তে মানুষ মানুষকে প্রতারণা করছে, প্রবঞ্চনা করছে। নিজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থের জন্য অন্যের চরম ক্ষতি করতেও মানুষ দ্বিধাবোধ করছে না। সব মিলিয়ে সমাজ তথা গোটা বিশ্ব এক ভয়ঙ্কর চেহারা ধারণ করেছে। যার ফলশ্রুতি হিসাবে প্রতারণা, খুন, নির্যাতন, নারীদের উপর অকথ্য অত্যাচার দিনের পর দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। তার কোন প্রতিকার নেই। আইন ও বিচার ব্যবস্থাও অনেক ক্ষেত্রে অসহায়। জ্ঞানবিজ্ঞান, শিক্ষায়-দীক্ষায় আজ আমরা হয়তো অনেক উন্নত, অনেক সভ্য হয়েছি কিন্তু আমাদের মধ্যে থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে সৌজন্যবোধ, সহনশীলতা, ভ্রাতৃত্ববোধ। আদর্শ পথে, সৎ ও নৈতিক পথে চলার পরিবর্তে মানুষ কখনও অন্ধের মতো, কখনও বা সব জেনে শুনেও মানবতাবিরোধী কাজ করে চলেছে। নির্বিচারে শেষ করছে একে অন্যের জীবন। এসব আচরণের মধ্যে দিয়ে আমরা যারা নিজেদের বিজ্ঞান চেতনায় সমৃদ্ধ সভ্য জীব বলে দাবী করি, তারা কী নিজেরাই নিজেদের প্রতিনিয়ত কলঙ্কিত করছি না? এখানেই শেষ নয়। মানুষের এই স্বার্থচারিতার্থের খেলার শিকার হচ্ছে প্রকৃতিও। আজ আমাদের নানা অত্যাচারে তাই প্রকৃতিও বিরূপ আচরণ করছে। নানা দুর্যোগ, নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয় নেমে আসছে আমাদের উপর।

এর প্রতিকার অসম্ভব নয়। আমরাই পারি নিজেদের জন্য বাসোপযোগী এক শান্তির নীড় তৈরি করতে। বুদ্ধদেব বলেছেন এর জন্য বেশি কিছুর প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শুধু বিবেকবোধ, সৎচিন্তা, সৎকর্ম। প্রয়োজন অন্তরের সৎ ইচ্ছার। এর দ্বারা কেবল একটি দেশে নয়, সমগ্র বিশ্বে মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ববোধ গঠন করা সম্ভব, যে বিশ্বে রাজত্ব করবে না হিংসা, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য। সুতরাং মহামানব গৌতম বুদ্ধের আড়াই হাজার

বছর পূর্বে প্রচারিত বাণীর প্রাসঙ্গিকতাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না, বরং তাঁকে অনুধাবন করে চলাই আমাদের কর্তব্য। এই কর্তব্যের কথা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর লেখায় আমাদের স্মরন করিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন- "পাশবতার সাহায্যে মানুষের সিদ্ধিলাভের দুরাশাকে যিনি নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন, যিনি বলেছিলেন 'অক্কোধেন জিনে কোধং', আজ সেই মহাপুরুষকে স্মরন করে মনুষ্যত্বের জগৎব্যাপী এই অপমানের যুগে বলবার দিন এল: *বুদ্ধং স্মরনং গচ্ছামি।* তাঁরই শরন নেব যিনি আপনার মধ্যে মানুষকে প্রকাশ করেছেন। যিনি সেই মুক্তির কথা বলেছেন, যে মুক্তি নঞর্থক নয়, সদর্থক; যে মুক্তি কর্মত্যাগে নয়, সাধুকর্মের মধ্যে আত্মত্যাগে; যে মুক্তি রাগ-দ্বেষ বর্জনে নয়, সর্বজীবের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রী সাধনায়। আজ স্বার্থ ক্ষুধান্ধ বৈশ্যবৃত্তির নির্মম নিঃসীম রুদ্ধতার দিনে সেই বুদ্ধের শরণ কামনা করি যিনি আপনার মধ্যে বিশ্বমানবের সত্যরূপ প্রকাশ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন"।[১৩] দেশ, সমাজ ও বিশ্বের মঙ্গলচিন্তায় তথাগতের এই ভাবনাতেই আমাদের চিত্ত প্রসারিত হোক- সব জীব সুখী হোক। জীব মাত্রই শত্রুহীন হোক। সবাই অহিংস হোক।

**তথ্যসূত্র:**


1) Rhys, Davids (1870). *Buddhism*, William and Norgate, London, P. 150.
2) চৌধুরী, সুকোমল (২০১৪). *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন*, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ৫৭।
3) তদেব, পৃ. ৫৮।
4) ধম্মপদ, (১৯৮৮). মিহির গুপ্ত (অনুবাদক ও ব্যাখ্যাকার), রণব্রত সেন (সম্পাদনা), হরফ প্রকাশনী,কলকাতা, পৃ. ১২৩।

5) চৌধুরী, সুকোমল (২০১৪). *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন*, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা, পৃ. ৬৫।
6) Prasad, Hari Sankar, (2007). The Centrality of Ethics in Buddhism-Exploratory Essays, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, p. 243.
7) ধম্মপদ, (১৯৮৮). মিহির গুপ্ত (অনুবাদক ও ব্যাখ্যাকার), রণব্রত সেন (সম্পাদনা), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৮৯।
8) Vinayapiṭake: MAHĀVAGGAPĀLI, (2008). Buddhāsasana Society, Pali Series 03, Ministry of Religious Affairs, Myanmar, p. 4।
9) ধম্মপদ, (১৯৮৮). মিহির গুপ্ত (অনুবাদক ও ব্যাখ্যাকার), রণব্রত সেন (সম্পাদনা), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ২৩১।
10) Vinayapiṭake: MAHĀVAGGAPĀLI, (2008). Buddhāsasana Society, Pali Series 03, Ministry of Religious Affairs, Myanmar, p. 10।
11) সেন, অমুল্যচন্দ্র (২০১৫). *ধর্মের লক্ষ্য, প্রসঙ্গ গৌতমবুদ্ধ : নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন*, ন্যাশানাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ১৬৫।
12) Prasad, Hari Sankar, (2007). The Centrality of Ethics in Buddhism-Exploratory Essays. Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, p. 234.
13) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (২০১৫). *বুদ্ধদেব, প্রসঙ্গ গৌতমবুদ্ধ : নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন*, ন্যাশানাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ১০০।

**গ্রন্থপঞ্জী:**


1) Prasad, Hari Sankar, (2007). The Centrality of Ethics in Buddhism-Exploratory Essays, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi.
2) The Book of the Discipline (Vinaya Pitaka), (1951). Volume – IV, Mahabagga, I. B. Horner (Translator), Luzac & Company Limited, London.
3) Buddhism as Philosophy: An Introduction, (2007). Mark Siderits, Ashgate Publishing Limited, Great Britain.
4) পবিত্র ত্রিপিটক (দ্বিতীয় খণ্ড), (২০১৭). শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির, ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু (অনুবাদক), ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ।
5) ধম্মপদ, (১৯৮৮). মিহির গুপ্ত (অনুবাদক ও ব্যাখ্যাকার), রণব্রত সেন (সম্পাদনা), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।
6) ভারতীয় ধর্মনীতি, (১৯৯৮). অমিতা চ্যাটার্জী (সম্পাদনা), এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা।
7) চৌধুরী, সুকোমল (২০১৪). গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা।
8) প্রসঙ্গ গৌতমবুদ্ধ : নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন, (২০১৫). অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী (প্রকাশক), ন্যাশানাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।
9) সান্যাল, জগদীশ্বর (২০১৪). *ভারতীয় দর্শন*, শ্রীভূমি পাবলিশিং হাউস, কলকাতা ।
10) Vinayapiṭake: MAHĀVAGGAPĀLI, (2008). Buddhāsasana Society, Pali Series 03, Ministry of Religious Affairs, Myanmar.